Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 165-176
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সহজিয়া প্রসঙ্গে বাউল

ডঃ প্রদীপ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

From the earliest period of Bengali Literature when it was in its infancy there was an unmistakable imprint of religion and philosophy. This paper purports to show how Sahajiyā cults or Sahajiyā Sādhanā had a dominating influence on the development of Caryā padas to Bāul literature. Caryā padas are perceived to be the songs of the Buddhist Sahajiyā Sādhanā. The belief systems in the Buddhist Sahajiyā Sādhanā were ingrained in the thinking that the whole world was the Nature of Sahajā which found its expression in the human body considered to be the temple. Truth of the universe is to be found in this temple which, in turn, reflects it in microcosm. So, the search for truth should be within the body without which the eternal Bliss cannot be experienced or realized. Integrally related to it is the tattva which is also found in the body. Therefore, for Buddhist and Sahajiyā Sādhakās, there is no need of roaming about the whole world. In both the philosophies of Buddhism and Vaishnava cults men and women are believed to be the divine incarnation and hence everyone has the ability to become Buddha or Krishna and Radha, realize the divinity within him or herself. Lord Krishna and Radha are only the symbolic representations of corporeal love-the finest and the purest. Nothing is beyond this pure and perfect love. The Vaishnava Sahajiyā never spoke of love beyond the purest and the perfect lover and beloved- the divine incarnations themselves. That the innermost eternal believed is the 'Man of the Heart' ('Moner Manush') is reflected in the utterance of Sahajiyā Sādhakā Chandidas where man is the supreme truth. This is true also of the Bāuls who cherish a love between human personalities and through which a union with the Divine is to be realized. Interestingly a close affinity of Bāul songs and Bāul Sādhanā could be found in the medieval songs of Sant poets of Central and Northern India. No less important is the fact that Sūfism in India is also found to have influence on Bāul Sādhanā and Bāul songs. This paper tries to show through a detailed study and analysis of Buddhist Sahajiyā, Vaishnava Sahajiyā cults and Bāul songs and other medieval Sant poets of India, that all these may be called Sahajiyā in a general and broad sense.

Keywords: Sahajiyā Cults in Bengal - divine incarnation - Man of the Heart - Sahajiyā Bāul - Bāul songs.

'বাউল' অর্থে 'বাতুল' বা 'ব্যাকুল' বোঝায়। পাগলকেও বাউল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আসলে বাউল বলতে আমরা যে বিশেষ সম্প্রদায়কে বুঝি, তাদের আচার- আচরণ ভাবপদ্ধতিগুলি সাধারণের থেকে এতই খাপছাড়া যে তাদের পাগল বলেই অনুভব হয়। বাউলের পরিচয় দিতে গিয়ে 'বিশ্বকোষ'-তেও বাউলের এমন পাগলামিকেই তুলে ধরা হয়েছে- "বাতুলের ন্যায় এই সম্প্রদায়ের লোকের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংযোজিত করিয়া পরিধান করিয়া থাকে। বর্তমানে আমরা শখের বা পেশাদারী যে বাউল সম্প্রদায় দেখিতে পাই; তাহা ইহাদের অনুকরণে গঠিত। ভজন-গীতকালে নৃত্য ও বেশভূষা নিরীক্ষণ করিলে ইহাদিগকে বাতুল বলিয়াই অনুমিত হয়।"[১] প্রসিদ্ধ বাউল গবেষক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ও বাউলদের 'পাগল-পারা', 'মুক্ত', 'বায়ুধর্মী' মানুষ বলে চিহ্নত করেছেন। বলেছেন- "বাউল শব্দটির অর্থ হল পাগল। সম্ভবত সংস্কৃত 'বায়ু' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। বায়ু অর্থে স্নায়ুপ্রবাহ। অন্য আরেকটি ব্যূৎপত্তি একে শ্বাস- নিয়ন্ত্রণ - ক্রিয়া বা প্রাণায়মের সঙ্গে যুক্ত করে। সম্প্রদায়বিশেষে এর অভ্যাস আছে। এই ধর্মীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্র আর বৈষ্ণবধর্মের অপভ্রংশ থেকে। নামের উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক, বাউল তার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চলেছে। সতত ভ্রাম্যমান, সমস্ত পরম্পরার বন্ধন থেকে মুক্ত বাউলরা বায়ুর মতোই মুক্ত।"[২]

ঠিক কথা। বাউলের মতো চমকপ্রদ,কৌতূহলোদ্দীপক, অভাবনীয় ব্যাপার ভারতীয় ধর্ম এবং সাধনা-সংস্কৃতির জগতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার। বিচিত্র এঁদের আচার-আচরণ।বাউলেরা না মানে জাত, না মানে ধর্ম। এঁরা নিজেদের না হিন্দু ভাবে, না মুসলিম ঠাওরায়। না আছে এঁদের ধর্মভয়- না আছে সমাজের বালাই। লাজ-লজ্জা-ভয়ের নিকুচি করে এঁরা জীবনের এক অন্যব্রত নিয়ে সমাজ থেকে দূরে বসবাস করে। সবকিছুর বেড়া ভাঙা বাউলদের সমাজও ভালোচোখে দেখেনি; এঁরাও সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখাতে চায় যারপরনাই। কেউ ভিক্ষা করে, কেউ করে চাষাবাদ। সন্তান উৎপাদন এদের নিষিদ্ধ- তাই পরিবারও নেই, কোনো বাঁধনও নেই। গানই এদের জীবনসঙ্গী। এক এক জন বাউল এক এক জন সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গ করে। জাগতিক বিষয়-আশয়,লোভ-মোহ ইত্যাদিতে এঁরা নির্লিপ্ত। মন্দির-মসজিদ-কোরান-পুরাণে এঁদের কোনো আসক্তি নেই। তাপ্পিমারা বিচিত্র পোশাকের মতোই বিচিত্র এই বাউলেরা। আচারে ব্যবহারে সাধনায় সবেতেই স্বতন্ত্র; প্রচলিতের মধ্যে যেন মূর্তিমান বিদ্রোহ।

তবে পোশাক-পরিচ্ছদ জীবন-যাপন আচার-আচরণে যতই বিচিত্র হোক না কেন বাউল সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনা ভারতীয় ধর্মসাধনা সংস্কৃতির মধ্যে যে গভীর ঐক্য আছে, সেই ঐক্যের এক পরম ঐতিহ্যসূত্রটি ধারণ করে আছে। আপাত শিকড়হীন বলে মনে হলেও এঁদের সাধ্য-সাধনার জড়টি সেই ঐক্যের জঠর থেকেই রস আহরণ করে বিকশিত-পল্লবিত- কুসুমিত হয়েছে। বৈদিক ও অবৈদিক এবং লোকায়ত ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির যে অন্যতম প্রধান সাধনপন্থা 'সহজসাধনা', বাউলেরা সেই সহজ সাধনপন্থার পথিক। ভারতীয় সহজিয়া সাধনার সগোত্র আর এক সাধনপন্থা 'সূফীসাধনা', বাউল সাধনায় সেই মুসলিম ধর্মাশ্রিত সূফীসাধনারও ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'Obscure Religious Cults' গ্রন্থে বাউল সাধনার মধ্যে এমন বৈচিত্র্যে আশ্রয়ী ধর্মটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। ডঃ দাশগুপ্তের অভিমতটির বাংলা আনুবাদ তুলে ধরা হলো- "সাধারণ অর্থে বাউলিয়াগণও সহজিয়া। সহজিয়াদের প্রথম বৈশিষ্ট্য পরমতত্ত্ব সহজের কল্পনায়- সর্বভূত ও জীবনের স্বরূপ 'সহজ'ই অধ্যাত্ম-সাধনায় লক্ষ্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য জীবন ও ধর্মাচারণে সত্যোপোলব্ধির সহজ-সরল পথের অনুসরণে। এই ব্যাপক অর্থে উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ ভারতের সন্তকবি এবং শিখ, ও সূফী কবিগণও সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত- এই অর্থে বাঙলার বাউলগণও সহজিয়া ভাবধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ।"[৩] বাউল সাধনার এবং বাউল গানের বিশ্লেষণ করলে বস্তুত সহজিয়া ভাবধারার এবং সূফীপ্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

।।দুই।।

আমি কোথাই পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে। (গগন হরকরা)

বাউলের সাধনা এই 'মনের মানুষের' সাধনা– 'মনের মানুষের*'* সন্ধানেই বাউল ঘর-বাড়ি সমাজ-সংসার জাত-ধর্ম লজ্জা-ভয় সব ত্যাগ করেছেন। সংসার ত্যাগ করে আপন-পরের ভেদরেখা মুছে দিয়ে গৈরিক বসন ধারণ করেছেন। বৈরাগী হয়ে পথে নেমেছেন। 'মনের মানুষের*'* সাক্ষাতের আশাতে 'বাউল' হয়েছেন। শব্দ -সুর-তাল-ছন্দের আশ্রয়ে মনের মানুষের জন্য গানের ডালি সাজিয়েছেন।

কিন্তু কে এই 'মনের মানুষ'? এই মনের মানুষের স্বরূপই বা কী? কেমন করেই বা তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?- এমন জিজ্ঞাসার উত্তর লুকিয়ে আছে বাউলের সহজিয়া সাধনার ইতিবৃত্তে।

যা 'সহজাত' তাই-ই 'সহজ'– "সহজায়তে ইতি"।[৪] মানুষের সহজাত স্বভাবই সহজ। এই সহজের সাধনায় 'সহজসাধনা'–সহজ স্বাভাবিক মানুষই 'সহজমানুষ'। সহজিয়াদের সাধ্য এই 'সহজ মানুষ' আর সাধনপন্থা 'সহজসাধনা'।

সহজিয়াসাধক মনে করেন মানুষের জন্মলব্ধ সহজাত বৃত্তিগুলি প্রকৃত সত্য দর্শনের সহায়ক। সেই সহজাত বৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দিয়ে নয়, বরং বৃত্তিগুলিকে আশ্রয় করেই আপনার মধ্যে 'আপনার' উপলব্ধি- এই হল সহজসাধনার সারকথা। প্রচলিত শাস্ত্র যেখানে বৃত্তি নিরোধের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সাধনার কথা বলে, সহজিয়ারা সেখানে বৃত্তিকে আশ্রয় করেই দেবতার সন্ধান করতে চায়। তাই তাদের কাছে বেদ-বাইবেল-কোরান-পুরাণ ইত্যাদি কেতাবি নির্দেশ মূল্যহীন– তাঁরা 'দেলকিতাব'-এর আজ্ঞাবাহী। তাঁরা আত্মতত্ত্বের সিঁড়ি বেয়ে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে চায়– সহজিয়া সাধনা তত্ত্বগতভাবে এবং পন্থাগতভাবে এমনই সহজ। সহজসাধনার এমন সহজদর্শনের সারকথাটি পণ্ডিতজনের ব্যাখ্যাতেও স্বীকৃতি লাভ করেছে - "স্নান অধ্যয়ন- উপবাস দার্শনিকতা অথবা মূর্তিগঠন ও চিত্রাঙ্কনের দ্বারা সত্যকে লাভ করা যায় না– তত্ত্বদৃষ্টি ও যোগের দ্বারা দিব্য জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। সকল শাস্ত্রে ক্ষুধা এবং যৌন ক্ষুধাকে মানুষের আদিমতম বৃত্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই সব বৃত্তিকে অবদমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির এই ক্রমাগত নিরোধের দ্বারা মানুষ শুধু অসুস্থ ও স্নায়ু রোগগ্রস্থ হয়– তা মানুষকে তার স্বাভাবিক ধর্মপথে চালিত করেনা; যা মানুষকে তার সহজ ধর্মের পথে চালিত করেনা তা মানুষের স্বরূপোলব্ধির কোনো সাহায্যও করেনা। সহজিয়াদের মতে, মানবের সহজাত বৃত্তিগুলি সত্যদর্শনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক– সেজন্য এই পথই 'সহজপথ'। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় যেখানে সহজাত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চেয়েছেন, সহজিয়াগণ সেখানে তাদের উচ্ছেদ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলে তাদের পরিবর্তন ও উন্নয়ন করতে চেয়েছেন।"[৫] সহজিয়া সাধনায় এভাবেই মানুষের সহজাতধর্মের স্বীকৃতি লাভ ঘটেছে। এই তত্ত্বই সহজিয়াদের 'আত্মতত্ত্ব'। আত্মায় পরমাত্মা বোধ - মানুষের মধ্যে দেবতার জ্ঞান। সহজিয়াদের আত্মতত্ত্ব এমনই 'মানবিক'। সহজিয়াসাধক চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের দৈবীতত্ত্বের উপরে স্থান দিয়েছিলেন মানুষকে—

শুনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। (চণ্ডীদাস)

সহজিয়াদের আত্মতত্ত্ব এমন মানবপূজার নামান্তর। এই আত্মতত্ত্ব না জানলে বাউল হওয়া যায় না– ফকিরি নেওয়া যায় না। প্রথমে চাই আত্মতত্ত্বের দীক্ষা। বাউল গানে বারবার তাই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে—

আত্মতত্ত্ব বিচার কর
দেখি ওরে মনপাখি তুমি কী পড়ে পণ্ডিত হয়েছ
তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকী।

আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ সে তো নয় সামান্য
পরতত্ত্ব ব্যাঞ্জনবর্ণ য ফলাতে গণ্য
সে যে স্বর ভিন্ন নয় স্বর হতে হয় দুয়েতে মাখামাখি। (রামকৃষ্ণ দাস)

বর্ণ শিক্ষায় ব্যাঞ্জনবর্ণের আগে স্বরবর্ণ শিক্ষা করতে হয়– কারণ ব্যাঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সহায়তাই উচ্চারিত হয়; ঠিক তেমনই আগে আত্মতত্ত্ব জানতে হয়, পরে পরতত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব লাভ হয়। আত্মতত্ত্ব জানলে তখন আর পরমতত্ত্বের সঙ্গে উভয়ের কোনো ভেদ থাকে না– জীবাত্মা পরমাত্মার রূপ লাভ করে। বাউল সাধনার প্রথম সোপান হল এই সহজিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান। ‘মনের মানুষ’ বাস করে মনেতে। তাকে বাইরে অন্বেষণ বৃথা—

এই মানুষে সেই মানুষ আছে। (লালন)

ঘরের দুয়ার বন্ধ করে পরের দ্বারে ঘরের মানুষকে কখনও কী খুঁজে পাওয়া যায়!

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে। (লালন)

আপনার ঘরের তালা খোলার চাবি আপনার কাছেই আছে। বন্ধ দুয়ার একবার খুলে গেলে তখন আর কোনো দ্বিধা থাকে না। বাউল সাধনা এই আপনার ঘরের তালা খোলার সাধনা। তাই বাউল সাধকের পরামর্শ–

আগে মন মানুষ চিনে ধর
মানুষের মধ্যে মানুষ দিতেছে সাঁতার। (আর্জান শাহ)

এ তো গেল সহজিয়া তত্ত্বদর্শনের দিক, এবার পরিচয় নেওয়া যাক এর সাধনাগত আশ্রয়ের দিকটির।

সহজিয়া আত্মতত্ত্ব লাভের আশ্রয় অবলম্বন হল মানবদেহ। দেহকে আশ্রয় করে দেহের মধ্যে পরমসত্তার অনুভব হল সহজিয়াসাধনার প্রধান সাধন বৈশিষ্ট্য। সহজিয়াসাধনা তাই কায়াসাধনাও বটে।

‘যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই-ই আছে দেহভাণ্ডে’- সহজিয়াগণ এমন ‘পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বে’ (microcosm) বিশ্বাসী। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে, ভারতীয় সূফীসাধনায় ইত্যাদি সহজসাধনার বিভিন্ন ঘরাণায় দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শটি স্বীকৃত - “সহজিয়া মতে, দেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্ব এবং সহজরূপ পরমতত্ত্ব রয়েছে। সূফী ও বাউলগণের মতেও প্রিয়তম এই দেহমন্দিরেই রয়েছেন। মিথ্যা মানুষ তীর্থে-তীর্থে মন্দিরে মসজিদে অনুসন্ধান করে বেড়ায়।... বাউলের গানে দেহমন্দিরের হৃদয়পদ্মে ‘ভাবের মানুষ’- এর মিলনের জন্য অবিশ্রান্ত গুঞ্জণধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে।”[৬] সহজিয়া সাধনায় এভাবেই জীবে শিব তথা জীবাত্মায় পরমাত্মার অবস্থান স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাউল সাধনায় জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে এমনই অদ্বৈত সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে- “বাউলের প্রেম প্রত্যক্ষ ভাবে হৃদয় দেবতার সঙ্গে ব্যক্তি প্রেম।”[৭] এই হৃদয় দেবতাই ‘মনের মানুষ’। রবীন্দ্রগানে যে ‘মনের মানুষ’ বার বার সম্বোধিত হয়েছে ‘প্রিয়’, ‘জীবনেশ্বর’ বা ‘জীবনদেবতা’ নামে। সূফীদের কাছে এই অন্তরতম ভাবের মানুষই ‘আশিক’ অর্থাৎ ‘প্রেমিক’ নামে উচ্চারিত হয়েছে। মধ্য ভারতীয় সন্তদের সাধনাদর্শেও সহজিয়া কায়াসাধনার এই ধারা অনুসৃত হতে দেখা যায়। বিখ্যাত সন্তসাধক কবিরের দোঁহার ছত্রে ছত্রে মানব দেহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে শ্রদ্ধাঞ্জলি—

তন্ত্ন জানু মন্ত্ন জানু, জানু সুন্দর কায়া। (কবীর)

অর্থাৎ, আমি তন্ত্র-মন্ত্র কিছু জানি না, আমি জানি শুধু সুন্দর এই দেহকে। সন্তসাধক তুলসীও সাহেব বলেছেন—

জো ঘট চিন্‌হে আপনে, মুক্তি মুক্তি হোই জায়। (তুলসী সাহব)

অর্থাৎ, যে নিজের শরীরকে চেনে, তার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সন্তসাধক দাদুর কণ্ঠেও বারবার শোনা গেছে দেহমাহাত্মের কথা—

য়হু মসিত য়হু দেহুরা সৎ গুরু দিয়া দিখাই।
ভীতর সেরা বন্দগী বাহরি কাহে জাই। (দাদু)

অর্থাৎ, এই দেহই মসজিদ, এই দেহই দেউল, সৎগুরু তাই-ই নির্দেশ করেছেন। আপনার ভিতরেই যখন সব আছে তখন বাইরে তাকে অন্বেষণ বৃথা। বাউল সাধনায় সর্বতোভাবে এই কায়ার স্বীকৃতি। লালন আক্ষেপ করেছেন এই বলে—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর এক পড়শী বসত করে। (লালন)

বৃথাই মনের মানুষকে বাইরে বাইরে সন্ধান করে ফেরা। তাঁকে বাইরে খুঁজলে পাওয়া যায় না- তিনি বাস করেন আপনার অন্তরে—

খোঁজ খোঁজ খোঁজ হৃদয় মাঝে দেখতে পাবি বৃন্দাবন। (কুবির গোঁসাই)

দেহকে আশ্রয় করে এই যে দেহাতীতের সাধনা, এই সাধনার পথটি ‘উল্টাপথ’। বাউল সাধনায় এই উল্টাপথের সাধনাকে ‘উজান বাওয়া’ বলে। ‘উজান বাওয়া’ অর্থাৎ, বাইরে থেকে ভিতরে প্রত্যাবর্তন, রূপ থেকে স্বরূপে স্থিতি। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ‘ভারতীয় সাধনার ঐক্য’ গ্রন্থে এই উল্টাসাধনার ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেছেন - “অধ্যাত্ম সাধনা সর্বদায় উল্টাসাধনা- বাহিরের দিকে হইতে ভিতরের দিকে ফিরিয়া তাকানো-বাহিরের দেশে হইতে অন্তরের দেশে ফিরিয়া যাওয়া। এই যে আমাদের জীবনের যাত্রা অমৃতের দেশে অমৃতস্বরূপ হইতেই তাহার আরম্ভ- পথ চলিতে চলিতে হয়তো সেই স্বরূপ হইতে অনেকখানি দূরে আসিয়া সরিয়া পড়িয়াছি- সেই অমৃতস্বরূপকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থই মৃত্যুর হাতে পড়িয়া লাঞ্ছনা ভোগ করা। এই চলার পথে একবার ‘আবৃতচক্ষুঃ’ হইতে হইবে-তারপরে উল্টাপথে ফিরিয়া যাইতে হইবে দেহ হইতে আত্মায়- স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, মৃত্যু হইতে অমৃতে; ইহাকেই বলে উল্টাসাধনা।”[৮] এই আত্মোপোলব্ধি-ই সত্যদর্শন। রূপের নমধ্যে স্বরূপকে অন্বেষণ - বাউলগানে এই সহজতত্ত্ব বারবার উচ্চারিত হয়েছে—

রূপে কর সেই রূপ পরিচয়
রূপে স্বরূপের আশ্রয়। (আর্জান শাহ)

আর একবার এই রূপ-স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে দেহী আর দেহাতীতের মধ্যে দ্বৈত্বভাব ঘুচে যায়—

দর্পণেরে সামনে ধরে নিজের রূপে নজর করে
তখন দর্পণের রূপ যাই গো সরে
আপন রূপে মোহিত হয়। (আর্জান শাহ)

এই আপন রূপটিই আসল রূপ, এই আপন রূপের দর্শনই সত্যদর্শন। সহজসাধক আপনাতে তথা মানবে ওই সহজ স্বরূপ দর্শনের সাধক।

রূপে স্বরূপের উপলব্ধি না ঘটলে সাধনা বৃথা। মৃণ্ময়ে চিন্ময়ের আবাহন করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্ভব। তাই সাধনার শুরুতে যতক্ষণ না এই রূপে স্বরূপ বোধ জন্মে ততক্ষণ ‘আরোপ-সাধনা’-কে উপায় করে এগিয়ে যেতে হবে। রূপে স্বরূপের এই কল্পনা সহজিয়া সাধনায় ‘আরোপ-তত্ত্ব’ নামে পরিচিত। সহজিয়া বৈষ্ণব মতের সাধক-সাধিকারা আপনাতে কৃষ্ণ এবং রাধাভাব আরোপ করে *‘যুগলসাধনায়’* অংশ গ্রহণ করে। আরোপ

সাধনার উচ্চস্তরে সাধক-সাধিকা আপনাকে পূর্ণজ্ঞানে কৃষ্ণ এবং রাধা এই উপলব্ধির প্রাপ্তি ঘটে। স্বামী পরমানন্দ তার 'বাউলের মর্মকথা' গ্রন্থে আরোপ-তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন - "প্রাকৃত প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব আরোপ করে থাকেন, কারণ স্বরূপে তারা শ্রীরাধা কৃষ্ণ। সাধনায় সিদ্ধ হলে বোধের পূর্ণতায় তারা উভয়ে কৃষ্ণত্ব এবং রাধাত্ব প্রাপ্ত হবেন– আপন স্বরূপেই তারা পরম আনান্দ আস্বাদন করবেন আর এটাই হল সহজপুরে স্থিতি।"[৯] বাউল সাধনায় আপনাতে 'সহজমানুষ' বা 'মনের মানুষের' যে সাধনা তার স্থিতি এই 'সহজপুরে'। অনেক বাউলই আপনাতে কৃষ্ণ এবং সাধনসঙ্গিনীতে রাধাভাব আরোপ করে 'যুগলসাধনায়' ব্রতী হন। সহজিয়া চণ্ডীদাস এই আরোপ-সাধনাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা বলেছেন—

ছাড়ি জপতপ সাধহ আরোপ
একতা করিয়া মনে। (চণ্ডীদাস)

বস্তুত, মানবিক আদর্শের পরাকাষ্ঠা এই আরোপ-তত্ত্ব। মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে তার মধ্যে দেবত্বের অনুসন্ধান-এ এক মহৎ মানবসাধনা। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরোপ-তত্ত্বের এই মহত্ত্বের দিকটি সম্পর্কে যথার্থ আলোকপাত করেছেন। বলেছেন- "সহজিয়াদের আরোপের অর্থ কী? এটি মানুষের মধ্যে দৈহিক– জৈবিক– মনস্তাত্ত্বিক সর্ব তত্ত্বের মধ্যেই পরমতত্ত্বের সন্ধান প্রচেষ্ঠা।"[১০] সহজিয়া সাধনায় মানবের এই মরদেহ ও প্রাকৃত মানুষের প্রেমকে এমনই মহত্তর মহিমা দান করেছে।

সহজিয়া সাধনা একান্ত ভাবেই গুরুবাদী সাধনা। গুরু ছাড়া সাধকের এক পাও চলার উপায় নেই। বস্তুত, যে কোনো ধর্মসাধনায় গুরুর আবশ্যিকতা চিরন্তন মহিমান্বিত। হিন্দুশাস্ত্রে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে গুরু মাহাত্ম্যের কথা উচ্চারিত হয়েছে এই ভাবে—

অজ্ঞানতিমিরন্ধাস্যজ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চুক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। (গুরুপ্রণাম মন্ত্র)

অর্থাৎ, তিনিই গুরু যিনি অজ্ঞান তিমির প্রভাবে অন্ধ শিষ্যের চক্ষুদ্বয়কে জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মোচিত করে দেন। সহজ কথায় গুরু-ই শিষ্যকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আলোকে পৌঁছে দেন। শাস্ত্রে এই জ্ঞানচক্ষু 'তৃতীয় নেত্র' নামে অভিহিত। বৌদ্ধ সহজিয়াদের গানে, বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলিতে বারবার গুরুমাহাত্ম্য উচ্চারিত হয়েছে। যেমন—

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ। (চর্যা নং ১)
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি। (চর্যা নং ৮)

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক লুইপা, কামলিপা প্রমুখেরা সাধ্য এবং সাধনার প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুকে স্মরণ করেছেন। বাউল সাধনাতেও গুরুর স্থান সবার উপরে। লালনের গুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই। তাঁর গানে বারবার সিরাজ সাঁইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে গুরুকে শুধু 'সাঁই' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। বাউল গানে আছে—

দেহের তত্ত্ব জানাবো তবে আগে যেয়ে গুরুর চরণ ধর। (দীন শরৎ)
গুরু কও শুনিহে সারাৎসার। (দীন শরৎ)

স্বরূপ রূপে রূপের কিরণ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভুবন
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন একবার দেখ নয়ন খুলে। (লালন)

।। তিন।।

তত্ত্বের কথা থাক। এবার সহজিয়া বাউল সাধনার সঙ্গে অন্যান্য সহজিয়া সাধনার যোগ - বিয়োগের যে সম্বন্ধ তার পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

বাংলার বাউল সাধনার সঙ্গে বৌদ্ধসহজিয়া সাধনা, সহজিয়া বৈষ্ণবসাধনা এবং মরমিয়া সূফীসাধনার আদর্শের গ্রহণ-বর্জনের গভীর যোগ লক্ষিত হয়। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই প্রধান চার সাধনাদর্শের পরিচয় গ্রহণ করবো।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্ব হচ্ছে 'ক্ষণিকবাদ', যার সহজ অর্থ হল, পৃথিবীর সব কিছু সতত পরিবর্তনশীল, স্থায়ী সত্তা বলতে কিছু নাই। এই সতত পরিবর্তনশীল নিয়মের সংসারে মানুষ রোগ-জ্বালা-মৃত্যু ইত্যাদির কারণে চরম দুঃখের সম্মুখীন। গৌতমবুদ্ধ মানুষকে এই দুঃখ থেকে নিবৃত্তির পথের সন্ধান দিতে চাইলেন। বৌদ্ধধর্ম পল্লবিত হয়েছে বুদ্ধ কথিত চারটি সত্যকে আশ্রয় করে। এই চারটি সত্য হল - দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং তার জন্য সঠিক পথ জানা চাই। দুঃখের নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধ জীবনচর্চার ক্ষেত্রে 'মধ্যপন্থা' ('মজঝিম পটিপদা') এবং 'অষ্টাঙ্গিকমার্গ' (মগ্গ) অনুসরণের নিদান দিয়েছেন। 'মধ্যপন্থা' বলতে বুদ্ধ বলেছেন চরমসুখ ভোগও নয় বা চরম কৃচ্ছসাধনও নয়। এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করতে হবে, তাতেই জীবনের পরমলক্ষ্য 'নির্বাণ' 'লাভ সম্ভব।

বুদ্ধের মৃত্যুর পরপরই তার নির্দেশিত পথ পাথেয় এবং লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধগণ দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়। এই সম্প্রদায় দুটি 'মহাযান' ও 'হীনযান' নামে পরিচিত। হীনযানীরা ভববন্ধন থেকে আপনার নির্বাণ আদর্শকে গ্রহণ করতে চাইলেন। বৌদ্ধ ধর্মদর্শনে এরা 'থেরবাদী' নামে পরিচিত। অন্যদিকে মহাযানীরা জগতের প্রতিটি মানবের নির্বাণ চাইলেন। বিশ্বের কল্যাণকে তারা ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে বড় করে দেখলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে সকল মানবে বুদ্ধ বিরাজমান। সাধনার দ্বারা সেই বুদ্ধত্বের উদ্বোধন সম্ভব। আপনাতে বুদ্ধত্বের এই উদ্বোধনই নির্বাণ,আর এই নির্বাণেই 'মহাসুখ'বা 'সহজসুখ'লাভ ঘটে।

কালে মহাযানীরা বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি।পরে এই শাখাগুলি সবই সহজযান নামে পরিচিতি লাভ করে। হিন্দুতন্ত্রের প্রভাবে ক্রমেই এই সহজযানীদের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে। বিভিন্ন মন্ত্র, তন্ত্র, যৌগিক ক্রিয়াকলাপ সহজযানীদের সাধনায় স্থান লাভ করে। হিন্দুতন্ত্রের মৈথুনতত্ত্ব, পঞ্চ-মকারতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব ইত্যাদি গৃহীত হওয়ার ফলে এক নতুন সাধনাদর্শের রূপ লাভ করে যা বৌদ্ধসহজিয়া তান্ত্রিকসাধনা নামে পরিচিত।

সহজিয়া বৌদ্ধদের লক্ষ্যই ছিল কায়ার মধ্যে বোধিচিত্তের উদ্বোধন। এই বোধিচিত্ত হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শূন্যতাবোধ। বোধিচিত্ত লাভ হলেই সাধক সহজসুখ লাভ করেন। সাধকের বোধিচিত্ত দেহাস্থিত বিভিন্নচক্র ভেদ করে মস্তকে অবস্থিত 'মহাসুখচক্রে' গমন করলেই সাধকের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ওই মহাসুখচক্রেই পরমবুদ্ধ অবস্থান করেন। পরমবুদ্ধের সঙ্গে বোধিচিত্তের মিলনই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকের পরম লক্ষ্য। এই মিলনেই নির্বাণ। হিন্দুতন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী সাধনার যৌগিক পথের অনুসরণে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ এই মহাসুখ লাভের সাধনা সম্পন্ন করেন। 'প্রজ্ঞা' এবং 'উপায়' চিত্তের এই দুই অবস্থার সংযোগ ঘটাতে পারলে তখনই সাধনা সম্পূর্ণ হয়। বলাবাহুল্য প্রজ্ঞা উপায়ের এই মিলন হিন্দুতন্ত্রের শিব-শক্তি মিলনের সাযুজ্যে কল্পিত হয়েছে। সহজসুখ দেহেই আছে। তাকে বাইরে অন্বেষণ বৃথা—

উজুরে উজু ছাড়ি মা লাহুরে বঙ্ক
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক
হাথের কাঙ্কন মা লেউ দাপন।
অপনে অপা বুঝতু নি অমন। (সরোহপা)

অর্থাৎ,ঘরের বস্তুকে কেউ কী লঙ্কায় খুঁজতে যায়, হাতের কঙ্কণ দেখার জন্য দর্পণের কী বা প্রয়োজন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার সহজকথা এমনই সহজ। বাউলের কায়াসাধনাতে বৌদ্ধ সহজিয়াদের এই সহজসুখ প্রাপ্তির সাধন আদর্শ অনুসৃত হতে দেখা যায়। বাউল গানে এমন 'সহজ' আদর্শ উচ্চারিত হয়েছে বারবার।

তবে বাংলার বাউল সাধনায় সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব সব থেকে বেশি। বৈষ্ণব সহজিয়াগণেরও মূল সুর হল– "বস্তু আছে দেহ বর্তমানে। সব বস্তু বা তত্ত্বই আছে দেহের মধ্যে। ভারতবর্ষীও সূফী সাধকগণও এই সত্যটি গভীর ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙলার বাউলরা ত দেহকেই দেউল করিয়া লইয়াছেন।"[১১] বৌদ্ধ সহজিয়াগণ যেখানে সহজজ্ঞান লাভের জন্য মৈথুন সাধনা প্রণালীকে আবশ্যিক করে নিয়েছেন বৈষ্ণব সাধকগণ সেখানে নরনারীর প্রেমকে সহজরূপে গ্রহণ করেছেন এবং সেই প্রাকৃত প্রেমকে অপ্রাকৃত প্রেমের স্বর্গীয় মহিমা দান করেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের এই প্রাকৃত প্রেমের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য পরিণাম বাউল সাধকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাউলের 'মনের মানুষ' এমন অপার্থিব প্রেম সৌন্দর্যের সারাৎসার দিয়েই নির্মিত।

আরোপ-তত্ত্বের' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবের কৃষ্ণ রাধা প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যেখানে কৃষ্ণ রাধায় একে দুই কল্পনা করেছেন, সহজিয়া বৈষ্ণবগণ সেখানে দুইয়ে এক এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। নরনারীর মধ্যেই কৃষ্ণরাধার চিরন্তন অবস্থান- এই জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটলেই এক আর দুই থাকে না– দুই এক হয়ে যায়। প্রাকৃত নরনারী কৃষ্ণরাধার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে- প্রাকৃত প্রেম ব্রজের বস্তু হয়ে ওঠে। বাউল সাধনায় এমন আরোপ-তত্ত্ব সর্বতোভাবে গৃহীত হয়েছে। অনেক বাউল নিজেকে 'বৈষ্ণব বাউল' বলে পরিচয় দেন। অনেক বাউলকেই দেখা যায় 'জয় রাধে' ধ্বনি তুলে কুশল বিনিময় করতে। আবার বিভিন্ন বাউল বা বৈষ্ণবের মেলা, সমাবেশ, মহোৎসবে উভয়ের ভিড় নজর কাড়ার মতো। অনেক বাউলই বৈষ্ণবদের মতো মালা-তিলক ধারণ করেন। বেশির ভাগ বাউল সঙ্গিনীকে 'বৈষ্ণবী' নামে ডাকা হয়। বাউল সাধনায় রাধাকৃষ্ণ ভজনার সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দের ভজনাও শোনা যায়। বাউলেরা বিশ্বাস করেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে বাউলধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধসাধক। তিনি 'প্রকৃতি' বর্জিত হয়ে সাধনা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বৈষ্ণবের সঙ্গে বাউলের কোনো যোগ নেই বলেই অভিমত জানিয়েছেন—

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবের যোগ নাই। (দুদ্দু শাহ)

বাউল এবং বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এমনই স্বীকার - অস্বীকারের জোড়কলমী সম্বন্ধ বর্তমান।

তবে বাউলদের রসসাধনা যে সহজিয়া বৈষ্ণবের রসতত্ত্বের অনুসারী সেকথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনায় কৃষ্ণ হলেন 'রসস্বরূপ'। 'রস' অর্থাৎ আস্বাদক। আর রাধিকা হলেন 'রতিস্বরূপা'। 'রতি' অর্থাৎ রসের বিষয়। অনেক জায়গায় এই 'রস' ও 'রতি', 'কাম' ও 'মদন' নামে অভিহিত। সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনায় প্রাকৃত নায়ক নায়িকায় এই রস-রতির তত্ত্ব আরোপিত হয়েছে। বাউলও বিশ্বাস করেন প্রাকৃত নরনারীর মধ্য দিয়েই রাধাকৃষ্ণের রসলীলা প্রবাহিত। তাদের কাছে প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত প্রেম স্বরূপ। বাউলের এই অপ্রাকৃত রস সাধনার তাৎপর্যটির চমৎকার ব্যাখ্যা শোনা যায় স্বামী পরমানন্দের কণ্ঠে। তিনি বলেছেন- "প্রকৃতি আশ্রয় বাউলের সস্তা ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য নয়– এটা প্রাকৃত কামকে অতিক্রম করে অপ্রাকৃত কামে অর্থাৎ প্রেমে উত্তরণের জন্য। এই কারণে বাউলদের কাছে নারী হ্লাদিনী স্বরূপিনী মহাশক্তি রসময়ী এবং প্রেমময়ী প্রকৃতি।"[১২] বাউলের 'বস্তুসাধনা' (বস্তু = শুক্র) বৈষ্ণবসহজিয়া রসতত্ত্বের অনুরূপ। বাউল গানে আছে—

রসিক তো রমন ছাড়া থাকে না
কেবল স্ত্রী পুরুষে রমন করা নয়
আত্মায় আত্মায় রমন হলে রসিক তারে কয়

তারা শুধু আত্মাকে ভেদ করিয়ে সদাই লক্ষ্য পানে দেয় হানা। (মনোহর দাস)

বাউল সাধনায় এভাবেই প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত রসের বস্তু হয়ে উঠেছে- নারী-পুরুষ আশ্রয়ী হয়েও যে রস লোকোত্তর ভাবের বস্তু বা প্রেমের সামগ্রী হয়ে উঠেছে—

পুরুষ নারী দুই জাতি দেখে কেন দেখনা
দুই জনে খেলা খেলে যুগল রূপে ভজনা। (কমল দাস)

বৈষ্ণবের মতোই সূফীরাও প্রেমের কাঙাল। সূফীধর্মের মূল কথা 'প্রেম' - "সূফী ধর্ম দর্শনের মূল কথা হল ঈশ্বরের প্রেমে সমস্ত জগত পরিব্যাপ্ত। মানুষের মধ্যে সেই অপার্থিব প্রেম জেগে উঠলে তার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য যে বিরহ বোধ জেগে ওঠে সেই বিরহের অগ্নিতে আত্মনাশ হলেই ভগবানের সঙ্গে তার পূর্ণ মিলন এবং সেই মিলনের মধ্যেই তার মুক্তি।"[১৩] সূফীধর্মের সাধন ক্ষেত্রটি এমনই প্রেম-বিরহ-মোক্ষের ত্রিবেণী সঙ্গম। ঈশ্বরের প্রেম লাভের জন্য তাদের সাধনা। এই প্রেমের জন্য সূফীসাধক আত্মোৎসর্গও করতে পারেন। বিখ্যাত হিন্দী কবি জায়সী ছিলেন সূফী সাধক। তার 'পদ্মাবতী' কাব্যে সূফীধর্মের এই প্রেমবাদ স্থান পেয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি ইরাণীয় সূফীধর্ম ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের প্রেম বিরহবোধের সঙ্গে যুক্ত হয় যোগাচারবাদ, ষটচক্রভেদ প্রণালী, কায়াসাধনা ইত্যাদি ভারতীয় সাধনা বৈশিষ্ট্য। নাচ(*'হালকা'*), গান (*'সামা'*), কীর্তন (*'দারা'*), মূর্ছা (*'হাল'*) ইত্যাদি ছিল এই সম্প্রদায়ের সাধন ভজনের অবলম্বন। বৈষ্ণব এবং বাউল সাধনাতে এই সমস্ত অঙ্গগুলি সূফী সাধনার থেকে এসেছে বলে পণ্ডিতের অভিমত।

সূফী সাধনায় ঈশ্বর হলেন প্রেমিক(*'আশিক'*) স্বরূপ, আর ভক্ত হল তার *'মাসুকা'* বা প্রেমিকা। আশিকে - মাসুকায় মিলনই সূফী সাধনার লক্ষ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের এই বিলীন হয়ে যাওয়াকে সূফীসাধনায় 'ফানা' বলে। বাংলার বাউল সাধনায় মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের সাধনায় সূফীর এই ফানা তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব আছে। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন- "বাউল যে মুক্তির সন্ধান করে তা হল সব রকমের বাইরের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি। মুক্তি পেতে গেলে মানুষকে মরতে হবে বেঁচে থেকেও। একে বলা হয় 'ফানা'। এ শব্দটি প্রায়ই উচ্চারণ করেন সূফী মরমিয়া সাধকরা।"[১৪] বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া- বাউলগানে এই ফানা 'জ্যান্তেমরা' বলে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রাকৃত দেহে ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে মৃতবৎ আচরণ করলেই অপ্রাকৃত প্রেমের বাতাস লাগে,বাউলেরা একেই বলেন 'জ্যান্তেমরা'। লালনের গানে আছে—

সাঁই দরবেশ যারা আপনারে ফানা করে অধরে মেশে তারা।
মন যদি আজ হওরে সে ফানার ফিকির
যাও জেনে সে খানার ফিকির ধর অধরা।
ফানার ফিকির না জানিলে ভস্ম মাখা হয় সারা।
কূপজলে যে গঙ্গার জল পড়িয়ে হয় রে মিশাল উভয় এক ধারা
তেমনি জেনো ফানার করণ রূপে রসে মিলন করা। (লালন)

-রূপ অর্থাৎ ব্যক্তি আমি, রস অর্থাৎ মনের মানুষ (=অধর) উভয়ের মিলনই 'ফানা'।
বাউলের আলখাল্লা পোষাকেও সূফী সাধকবৃন্দের পোষাকের প্রভাব আছে। সর্বোপরি সূফীধর্ম আদ্যান্ত মানবিক ধর্ম। মানুষের মধ্যেই সূফীর ঈশ্বর বর্তমান।

মানবপ্রেমই সূফীর সর্বসাধ্যসার। আর এই প্রেম লাভ করতে গেলে 'মুর্শিদ' বা গুরু আবশ্যক। আলাউল ছিলেন সূফীসাধক। তার *'পদ্মাবতী'* কাব্যের ছত্রে ছত্রে সূফী ধর্মদর্শনের তত্ত্ব কণাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন সূফী প্রেমবাদ, গুরুবাদ, ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলাউল লিখেছেন—

যার হৃদে জনমিল প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পায় সেই সভান ঠাকুর।।
যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরিল।।
বাঞ্ছিত পুরণ হেতু গুরু পরশণ।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের আঞ্জন।। ('পদ্মাবতী ', আলাওল, আত্মপরিচয়)

মুসলমান ধর্ম থেকে আগত অনেক বাউলই এই সূফী আদর্শকে শিরোধার্য করে মনের মানুষের সাধনা করেছেন।

বাউলেরা প্রেমের কাঙাল– "বাউলেরা স্বর্গের সুখ চাহেন না। চাহেন মুক্তির পরমানন্দ। বাউলেরা বলেন, মুক্তি হইল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ। এই মুক্তি লাভ করিলে ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য সাধক আপনিই পায়, যদিও কিছুই পাইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ... বাউলেরা বলেন, জীবনের সার অমৃত হইল তাহার প্রেম ও প্রেমের ব্যাকুলতা।"[১৫] মরমীয়া সূফীদর্শন ও বাউলের প্রেমবাদ এভাবেই একসুরে বাঁধা।

সন্তসাধকের পথও এমন প্রেমের পথ। অহৈতুকী প্রেমভক্তি সন্ত সাধকদের সাধনা। সন্তরা বৈকুণ্ঠবাস চান না; তাদের একমাত্র কাম্য পরম প্রিয়র দর্শন লাভ - পরম প্রিয়র সান্নিধ্যে থাকার বাসনা। রামভক্ত দাদুর বাসনা–

দাদু রাতা রাম কা পীবৈ প্রেম অঘাই।
মতিবালা দীদার কা মাগৈ মুকক্তি বলাই।। (দাদু)

-অর্থাৎ, দাদু রামের অনুরক্ত, প্রেমরস পান করে সে রাম দর্শনের জন্য পাগল। মুক্তি তাঁর কাছে বালাই । সন্ত প্রাকৃত প্রেমিক প্রেমিকার মতই তাঁকে একান্ত আপনার করে পেতে চান। প্রেমহীনতা তাঁকে কাতর করে, ব্যকুল করে, হতাশ করে– "ঈশ্বর যেখানে সর্বজনীন, সাধকের উপলভ্য ও সাধ্য– তিনি মূর্ত হন, বা অমূর্ত, বা বিশ্বলীন– তাতে প্রেমিক ভক্তের মন ওঠেনা। সে চায় আরও একান্ত ভাবে পেতে। তখন মনের মধ্যে তাঁর স্থান হয়, তিনি হন হৃদগত দেবতা, personal god। ...সন্তদের ভগবান অন্তঃশীল, এদের মধ্যে কেউ যে তাঁকে অপরের থেকে আড়াল করে নজরবন্দী ও আত্মসাৎ করেন তাতে ঈর্ষার ভাব দেখাবেন সেটা স্বাভাবিক।"[১৬] সন্তদের প্রেমে এই ঐশ্বরিক প্রেমঈর্ষা দেখা যায়। মিলনেও তার সুখ নেই, বিচ্ছেদের বিরহে তিনি সর্বদা কাতর। বৈষ্ণব সাধনাতেও এই প্রেম বিরহের ঐকান্তিক প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্যও মূলত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। আর বাউল গানে সেই অনন্ত প্রেম পিপাসা ধ্বনিত হয়েছে কথায় কথায়—

এসো এসো প্রাণের বন্ধু গো আমি দেইখ্যা মনের সাধ মিটাই
আমার দেহ পুইর‍্যা হইল আঙ্গার তুই আমার কিসের বন্ধুগো ...। (লালন)

বাউল গান- বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার গান - সাধনসংগীত। বেশির ভাগ বাউলই ছিলেন নিরক্ষর; অনেক সময় সমাজের যাকে বলে 'নিচুঁতলা'- অনেকেই সেই অন্ত্যজ সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন এই ধারায়। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মনের মানুষের সাধনশিক্ষা করে গেছেন। বাউলের কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ নেই– নেই কোনো লিখিত পথ নির্দেশ। গানই তাদের শাস্ত্র– গানেই তাদের সাধ্যসাধনার ইতিবৃত্ত উচ্চারিত হয়েছে।

অন্যদিকে গান তাদের সাধনার বিশেষ অঙ্গ রূপেও স্বীকৃত। পারমার্থিক মিলনের মধ্যস্থতায় গানের ভূমিকা যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু আছে– সূফীদের মধ্যেও চালু; তেমনই বাউল সাধনাতেও গানই তাদের মন্ত্র, গানই তাদের উপাচার। বৌদ্ধ সহজযানী সম্প্রদায়ও গানকে সহজিয়া সাধনার অঙ্গ করে নিয়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা চর্যাগুলো সবই গান। সহজিয়া সাধনায় প্রথম থেকেই গানের এমন ঐতিহ্য পরম্পরা বর্তমান।

সাধনসংগীত সাধকের উপলব্ধির সারাৎসার। ঐশী উপলব্ধি। জগৎ ও জীবনের মধ্যে পরমেশ্বরের অনন্তলীলা দেখে সাধক বিস্ময়-বিহ্বল-আত্মহারা হয়েছেন; দুশ্চর ব্রতসাধনা; কঠিন তপস্যা; দীর্ঘ আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে অর্জন করেছেন আত্মজ্ঞান– রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলব্ধি করেছেন; জীবাত্মায় পরমাত্মার সন্ধান পেয়ে জীবকে শিব জ্ঞান করে সর্ব মানবের কল্যাণে আপনাকে সঁপে দিতে জীবন পণ করেছেন। সহজিয়া সাধকের সাধনসংগীত সেই মহোত্তম অনুভূতির প্রকাশ। যাকে পাওয়ার জন্য এত সাধনা; যার হীনতায় তীব্র বিরহবোধ; তাকে পেয়ে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পরম প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস- সেই আবেগ, অনুভূতি, আনন্দের বাণীরূপই তো সাধকের গান। তাকে মিথ্যা বলি কি করে? সাহিত্য তো উপলব্ধির বস্তু। জগৎও জীবন সম্পর্কে মানুষের সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়ই শব্দ-ছন্দ-অলংকার ভাবের রসায়নে অলৌকিক রসের সামগ্রী হয়ে উঠে। রসসৃজনই সাহিত্যের লক্ষ্য। বাউলগান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষভেদী।

তাছাড়াও বাউলগানের ভাষা-ছন্দ-অলংকার এবং সুরের সহজতা মুহূর্তেই মন জিতে নেয়। গানগুলির মধ্যে গূঢ় ধর্মতত্ত্বের কথা সাধারণ শ্রোতা উপলব্ধি করতে পারল কি না সেটা বড় কথা নয়; গানগুলির সহজ সরল মাধুর্য সহজেই সকলকে মুগ্ধ করে। বাউলগানের এই সহজ আকর্ষণী ধর্মটিকে লক্ষ্য করে সমালোচক যথার্থই লিখেছেন -"তাঁরা তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করতে যে সকল উপমা-রূপকের ব্যবহার করেছেন যেগুলি একদিকে অতি সহজ, অন্যদিকে সেগুলি আশ্চর্যভাবে গূঢ়তাব্যঞ্জক। এত অল্পের মধ্যে ব্যঞ্জনায় এত গভীর এবং ব্যাপক অর্থ প্রকাশ পেয়েছে– প্রকাশভঙ্গি এত সংযত এবং সংহত যে অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিগণ এই সব পদ রচনা করেছেন তা চট করে সকলে বিশ্বাস করতে চায় না। ”[১৭] বাউল যখন বলেন—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন।
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজা কয়।। (হাসন রাজা)

বা

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আইসে যায়
তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পায়। (লালন)

তখন এর গূঢ়ার্থর থেকে এর সহজ সুর কথার সরলতা সাধারণকে আকৃষ্ট করে। গভীর তত্ত্বের এমন সহজ সরল প্রকাশ সত্যিই বিরল। বাউল গানের এই সহজ সরল সুরই বাংলা গানের জগতে বাউলগানকে বিশিষ্ট এক ঘরাণার গান হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় ভাবে সুরে বাউলগানের প্রভাব তো সর্বজনবিদিত। সহজিয়া বাউল গান এই সহজ স্বভাবের গুণেই বিশ্বের দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

উল্লেখসূত্র :

১. বসু, নগেন্দ্রনাথ, 'বিশ্বকোষ '(সম্পাদিত,১২খণ্ড), ১ম সং-১৮৮৬,পুনর্মুদ্রণ-১৯৮৮, বি.আর.পাবলিশিং, দিল্লী, পৃ.৭২০
২. সেন, ক্ষিতিমোহন, 'হিন্দুধর্ম,' ১ম সং. ৩য় মুদ্রণ-২০০৯, আনন্দ,কোলকাতা, পৃ.৯৭
৩. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, 'বাংলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা ', (মর্মানুবাদ,গোপীমোহন সিংহ রায়), ১ম প্রকাশ-১৯৯৬, ভারবি, কোলকাতা, পৃ.৬৯
৪. বসু, নগেন্দ্রনাথ, 'বিশ্বকোষ,' (সম্পাদিত,২১ খণ্ড), ঐ,পৃ.৩৪৪
৫. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ,__________(১৯৯৬), পৃ.৪১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৭১

৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৭১
৮. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য,' বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সংখ্যা-৪১, প্রকাশ, ১৪০৭, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কোলকাতা,পৃ.৬-৭
৯. পরমানন্দ, স্বামী, 'বাউলের মর্মকথা,'২য় সং.২০০০, পরমানন্দ মিশন প্রেস, বর্ধমান,পৃ.১৬
১০. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, 'বাংলা-সাহিত্যে গুহ্য সাধনার ধারা,' ঐ, পৃ.৬২
১১. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে,' ৮মসং.৬ষ্ঠ মুদ্রণ-১৩৮৭, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা পৃ.৩৬৯
১২. পরমানন্দ, স্বামী, ______________(২০০০), পৃ.৩৭-৩৮
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, 'পদ্মাবতী', (সম্পাদিত, ২য় খণ্ড-ভুমিকা), ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, পৃ.১১-১২
১৪. সেন, ক্ষিতিমোহন, 'হিন্দুধর্ম ', ঐ, পৃ.৯৮
১৫. সেন শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন, 'বাংলার বাউল', প্রকাশ -১৯৯৩, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৩-৫৮
১৬. মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র, 'মধ্যযুগের সন্তকবি', ১ম সং -১৯৭৮, জিজ্ঞাসা,কোলকাতা, পৃ.১৩৭
১৭. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, 'বাঙালা সাহিত্যে গুহ্য সাধনার ধারা ', ঐ, পৃ.৭৩